

নারী নির্মিত মূলধারার চলচ্চিত্রে “নারী দৃষ্টি” : একটি গুণগত বিশ্লেষণ

মো. আব্দুল করিম*

সার-সংক্ষেপ: বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার সম্মিলিত কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর মাধ্যম চলচ্চিত্র সময়ের পরিক্রমায় একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মাতাগণ মূলধারা ও বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রে সমাজকে চিত্রায়ণ করেছেন। কিন্তু ভাবলুতায় পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র সমাজেরই প্রতিফলক হিসেবে নারী-পুরুষের প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে যেতে পারেনি, বরং নারী-পুরুষের সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্যকে করেছে অধিকতর সুসংহত ও অনেকক্ষেত্রে বিস্তৃত। সত্তরের দশকে নারীবাদী তাত্ত্বিক লরা মালভি এর “পুরুষ দৃষ্টি” (male gaze) তত্ত্বটি চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। পুরুষ দৃষ্টির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চলচ্চিত্রে “নারী দৃষ্টি” (female gaze) ধারণা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। মালভি এর তত্ত্বানুসারে সেলুলয়েডে নারীকে পুরুষের চোখে নির্মাণ তথা নারী পুরুষের “দৃশ্যবস্তু” হলে নারীর দৃষ্টিতে নারী-নির্মাণ কেমন; সেটিই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে নারী নির্মিত পাঁচটি মূলধারার চলচ্চিত্রকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। স্টুয়ার্ট হল এর রেপ্রেজেন্টেশন এবং নারীবাদী তত্ত্বসমূহের আলোকে চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ উদ্ঘাটন, নারীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বিশ্লেষণ ও নারী নির্মাতার মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী রূপায়ণের “স্থানান্তর” বিশ্লেষণ করা হয়। নমুনাকৃত চলচ্চিত্রগুলোর গুণগত বিশ্লেষণ করে “নারী দৃষ্টি” ধারণার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। যেমন: নারী অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত উভয়ভাবে স্বাধীন, নারী মানবিক মানুষ এবং নিজেদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে সক্ষম। নারী দৃষ্টি ধারণার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি হয় মেড ইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে। সকল নারী পরিচালক নারী-নির্মাণে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো থেকে “পুরোপুরি” বের হতে পারেনি। তবে দর্শক চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ দর্শনে দেখন প্রিয়তার বদলে নারীর প্রতি এক ধরনের “অনুভূতি” কাজ করে; সেরকম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সকল নির্মাতার চলচ্চিত্রে চিহ্নিত হয়। তাছাড়া কয়েকটি চলচ্চিত্রে পুরুষ দৃষ্টির দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। এটা লক্ষণীয় যে, সকল নির্মাতাই চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে ভাঙ্গার জোর প্রয়াস দেখিয়েছেন। পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে যেয়ে চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ সময়সাপেক্ষ।

চাবিশব্দ: নারী নির্মাতা, চলচ্চিত্র, লিঙ্গ, নারীর রূপায়ণ, নারী দৃষ্টি

* প্রভাষক, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

১. ভূমিকা

১.১ প্রসঙ্গের অবতারণা

চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী গণমাধ্যম। স্থির চিত্রের চলমান প্রক্রিয়ায় গঠিত চলচ্চিত্র দর্শক চৈতন্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতিফলক হিসেবে এই শক্তিশালী মাধ্যমটি মানুষের জীবনাচরণেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব-সৃষ্ট চলচ্চিত্র শিল্প বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিকশিত হচ্ছে। বিকশিত এ শিল্প মাধ্যম বিনির্মাণে চলচ্চিত্রপ্রেমী সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে প্রতিনিয়ত। সেই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে নারী-পুরুষ উভয়। শিল্প বিনির্মাণে অংশীজন নারী-পুরুষ উভয় হলেও নির্মাণের উদ্দেশ্য দর্শক চাহিদা পূরণ করা। ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর লুমিয়ার নামের দুই ভাইয়ের হাত ধরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় (হায়াৎ, ২০১৮, পৃ. ২৯)। এরপর থেকে সেলুলয়েডে ইমেজ তৈরির প্রক্রিয়াটি পুরো বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে চলতে থাকে। চলমান প্রক্রিয়ায় সমাজকে বিশ্লেষণের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এই সেলুলয়েড। কারণ সমাজের নানান বাস্তব বিষয়বস্তুই চলচ্চিত্রের উপজীব্য হয়। কখনো কখনো চলচ্চিত্রের আধেয় বলে দেয় সমাজ বাস্তবতা বা সমাজ চিত্র কেমন। কোন একটি বিষয় সমাজে কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তার প্রতিফলন যেমন চলচ্চিত্রে পড়ছে ঠিক একইভাবে চলচ্চিত্রের আধেয় বা কন্টেন্ট এর প্রভাব মানবসমাজে পড়ছে। এটি একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক যোগাযোগ। এ মাধ্যমটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তথা ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রুটেন, ইতালি, সুইডেন, জাপান, ভারত এবং বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো উপমহাদেশ তথা কলকাতায় ১৯৩১ নির্মিত হয় কাহিনিচিত্র জামাই ষষ্ঠী (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৯)। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ১৯৫৬ সালে মুখ ও মুখোশ নামক মূলধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হয় (প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫২)। সময়ের আবর্তনে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বিপরীতে নানান ধারার চলচ্চিত্র এসেছে। কিন্তু চলচ্চিত্র সমাজেরই প্রতিফলক হিসেবে নারী-পুরুষের প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে যেতে পারেনি, বরং চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্যকে করেছে অধিকতর সুসংহত। পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে বৈধতার মোড়ক প্রদান ও পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে পুনরুৎপাদন করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ভূমিকা অনন্য। মার্কিন সাংবাদিক হাঙ্কেল (১৯৭৩) তাঁর বইতে বলেন, চলচ্চিত্র সমাজকে প্রতিফলন করে বা সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব রয়েছে। চলচ্চিত্র সমাজকে প্রতিফলন করতে যেয়ে নারীর মতাদর্শিক বা সামাজিক নির্মাণ চলচ্চিত্রে উঠে আসে যেখানে সে হয় নারী নন্দিত বা নিন্দিত (হক, ২০২২, পৃ. ৩২)। বাংলা চলচ্চিত্রে পুরুষের চরিত্রের নির্মাণ হয়েছে “দানব, দেবতা ও পতি” রূপে, আর নারী যুগে যুগে স্থান পেয়েছে “সতী, নষ্টা ও এক্সট্রা” হিসেবে। চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের অবস্থান চিত্রায়িত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার হাত

ধরেই। বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে পুরুষের চোখে চলচ্চিত্রকে উপভোগ্য করার জন্য তাঁরা নারীকে চলচ্চিত্রে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে, অন্যদিকে পুরুষকে করেছে শক্তিশালী। নারী হয় দ্রষ্টব্য আর পুরুষ হয় দ্রষ্টা (আবির, ২০১৬, পৃ. ৩৭)।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশে পুরুষ নির্মাতার পাশাপাশি চলচ্চিত্রে নারী নির্মাতার উদ্ভব হয়। ১৯৭০ সালে বিন্দু থেকে বৃত্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বাংলাদেশের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখান রেবেকা। এরপর ১৯৮৬ সালে আশা নিরাশা সিনেমার মাধ্যমে রোজি আফসারিও নারী নির্মাতা হিসেবে নিজেকে আবির্ভূত করেন। সুচন্দা, নারগিস আক্তার, শামীম আখতার, চয়নিকা চৌধুরী, মৌসুমী, শাওন, রুবাইয়াত হোসেন সহ এখন পর্যন্ত ১৯ জন নারী নির্মাতা স্বল্পদৈর্ঘ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে চলচ্চিত্র অঙ্গনে নিজেদের মেলে ধরেছেন। নারীরা চলচ্চিত্রে তাদের নিজেদের প্রতিরূপের পাশাপাশি তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা তাদের প্রতি সমাজিক বৈষম্যের রুঢ় চিত্রটিও তুলে ধরতে চায়। আর এসব তুলে ধরার ক্ষেত্রে নির্মাতাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন নারীবাদী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক লরা মালভি, স্টুয়ার্ট হল, জুলিয়া লি সেজে সহ আরও অনেকে। চলচ্চিত্রের অধিকাংশই পুরুষের প্রাধান্য মূলত পুরুষের প্রেম ভাবনা ও যৌন আকাঙ্ক্ষা তাড়নায় নারীর অবস্থান থেকে অবস্থানান্তর ঘটে; নারী যেন পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্রীড়ানকে পরিণত। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে দেখার পাশাপাশি নারীও নিজেদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে নারীদের দেখার সুযোগ তৈরি করছেন। নারীর চোখে নারীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা কতটুকু পূরণ হচ্ছে তথা চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ কেমন তা উদ্ঘাটন জরুরি।

১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বিশ্ব চলচ্চিত্রকে আজকের সাবলীল রূপে রাখার আনতে পুরুষদের তুলনামূলক অধিক অবদান থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রকে শিল্পে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে নারীরাও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বের প্রথম নারী পরিচালক ফ্রান্সের অ্যালিস গঁ-ব্লেসে (Alice Guy-Blaché) এর দ্য ফেইরি অব দ্য ক্যাবেজেস নামের প্রথম ন্যারেটিভ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৮৯৬ সালে (রাসেল, ২০২৩)। পুরুষ কর্তৃত্বের অধীনে থাকা চলচ্চিত্র শিল্প; শুধু হলিউড নয়, আধুনিক সিনেমার জন্মস্থান ফ্রান্স থেকে শুরু করে ভারত, জাপানের মতো দেশেও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীরা বিভিন্ন সময় ছিল উপেক্ষিত ও অবহেলিত। সমাজে নারীর অধস্তন ইমেজটি প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। গণমাধ্যমের একটি শক্তিশালী শাখা হিসেবে চলচ্চিত্রেও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের সৃষ্ট নারীর ইমেজটি উপস্থাপিত হচ্ছে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ২০টি দেশের ৫৫টা ব্লকবাস্টার সুপারডুপার হিট সিনেমা নিয়ে কাজ করেছে। সেখানে দেখা যায় মাত্র ২৭ শতাংশ ক্ষেত্রে নারীদের

প্রধান চরিত্রে দেখানো হচ্ছে। আবার এই ২৭ শতাংশ প্রধান চরিত্রে যে নারী আছে; তাদেরকে খুব একটা নেতৃত্বের জায়গায় দেখানো হয়নি (প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০২০)। নারী কোনো একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে বন্ধুর সমর্থন লাগছে। তাদের যে নিজস্ব একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও একটা পরিচয় বা আইডেন্টিটি আছে প্রভৃতি বিষয় চলচ্চিত্রে উঠে আসছে না। তবে বলা ভালো যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিকগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে তথা এক ধরনের স্থানান্তর ঘটছে। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বলেই বিশ্ব নারী নির্মাতাদের নিয়ে বেশ আগ্রহী এবং তৎপর।

১৯৭০ সালে বাংলা চলচ্চিত্রে নারী পরিচালকের অভিষেকের পর থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯ জনের মতো নারী পরিচালক কাজ করছেন। তাদের মতে এখনো চলচ্চিত্র শিল্পে নারীর ইমেজটি স্পষ্ট নয়। তাই নারীদের চোখে নির্মিত সিনেমায় নারীর ইমেজ উদ্ঘাটন জরুরি। ইমেজ উদ্ঘাটনে নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্বগুলো বেশ প্রণিধানযোগ্য। নারীবাদী তাত্ত্বিক ক্লেয়ার জনস্টন ১৯৭৩ সালে তাঁর *ওইমেস সিনেমা অ্যাজ কাউন্টার সিনেমা* নামে এক প্রবন্ধে বলেন, মূলধারার চলচ্চিত্র চর্চায় উপস্থিত মতাদর্শিক নির্মাণকে বুঝতে গেলে নারীকে কীভাবে “রেপ্রিজেন্ট” করা হচ্ছে তার পাশাপাশি অর্থ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থানের “ফলাফল” কী দাঁড়াচ্ছে তাও দেখতে হবে। অর্থাৎ নারীর “রেপ্রিজেন্ট” বুঝতে গেলে দেখতে হবে কীভাবে নারীকে ফ্রেমে বন্দি করা হয়েছে, নারীর শরীরের কোথায় এবং কীভাবে আলো ফেলা হয়েছে এবং কোন পোশাক নারীকে পরানো হচ্ছে ইত্যাদি। আর অবস্থান বুঝতে হলে বর্ণনা কাঠামোই নারীকে কতটুকু রাখা হয়েছে বা রাখা হয়নি তা বুঝতে হবে (হক, ২০২২, পৃ. ৩৩)। নারীবাদী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের মধ্যে লরা মালভি এর পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বটিতে বলা হয় পর্দায় যে পুরুষ চরিত্র তার চোখে নারী কেমন; দর্শক নারী চরিত্রটিকে পর্দায় কীভাবে দেখে; পুরুষ দর্শকদের পর্দার পুরুষের অবস্থান থেকে নারী চরিত্রটি দেখা। অর্থাৎ পর্দায় নারীর উপস্থাপন যাই হোক তা পুরুষের দৃষ্টিতেই। লরা মালভির পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বটির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ “নারী দৃষ্টি” ধারণাটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেখানে বলা হয় পুরুষের চোখের বদলে নারীর চোখে নারীর নির্মাণ। অর্থাৎ দর্শককে নারীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তথা নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার উপর জোর দেয়া হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ক্যামেরার সামনে-পিছনে কাজ করছে। নারী নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে নারীদেরকে কীভাবে উপস্থাপন, পুরুষতান্ত্রিকতার বাহিরে তথা নারীর দৃষ্টিতে গল্প বলা বা চলচ্চিত্রে নারীর নির্মাণের কোন স্থানান্তর সাধিত হয়েছে কিনা তার অন্বেষণ দরকার।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নারী নির্মিত মূলধারার চলচ্চিত্রে “নারী দৃষ্টি”: একটি গুণগত বিশ্লেষণ শীর্ষক গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বর্ণিত ধারার বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন ও নারীর দৃষ্টিতে সমাজের অন্য নারীদের দেখা প্রভৃতি অনুসন্ধান করা।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- ক. নারী নির্মিত বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ উদ্ঘাটন;
- খ. নারী নির্মাতার চলচ্চিত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বিশ্লেষণ;
- গ. পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নির্মিত মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী রূপায়ণের “স্থানান্তর” বিশ্লেষণ;

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন

- ক. নারী নির্মিত বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন কৌশল কী কী?
- খ. নারী নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণ কি পুরুষতান্ত্রিকতার বাহিরে?
- গ. পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্মিত মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণের ধরনে কী পরিবর্তন লক্ষণীয়?

২. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

২.১. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ ও জেভার সংবেদনশীলতা যাচাই নিয়ে তুলনামূলক ভালো কাজ হয়েছে। কিন্তু মূলধারার চলচ্চিত্রে নারীর দৃষ্টিতে নারী-নির্মাণ নিয়ে স্বল্প পরিসরে কাজ হয়েছে। আভার কন্সট্রাকশন: ফিমেইমল গেইজ ইন ফিল্ম গবেষণা প্রবন্ধে হোসাইন এবং অন্যান্য (২০২৩) বলেন, যুগ যুগ ধরে নারীরা সমাজে তাদের নিজস্ব পরিচয় অন্বেষণ করে চলেছে কিন্তু বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন। নারী পরিচয়ের চেয়ে মানবজাতি হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে চায় নারী কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে খুব সহজে বের হতে পারছে না। নারীদের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি এখনো পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। নারীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে এক নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্য নারী প্রভাব ফেলে। নারী মাতৃত্বের স্বাদ নিবে সেটাও তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারী ঘরের কাজ করবে, পুরুষ বাহিরের কাজ করবে, আবার নারী ঘরে এবং বাহিরে দুটোতেই কাজ করবে কিন্তু পুরুষ শুধু বাহিরের কাজ করবে এই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাও এই প্রবন্ধে উঠে আসে।

মূলধারার চলচ্চিত্রে জেভার উপস্থাপন প্রবন্ধে তালুকদার (২০২১) বলেন, পুরুষ চরিত্রকে প্রাধান্যশীল, কর্তৃত্ববাদী ও শক্তিশালী কিন্তু নারী চরিত্রকে মমতাময়ী, দুর্বল, অসহায়, যৌনবস্ত্র ও পুরুষ নির্ভর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকারের বিষয়টি একটি চলচ্চিত্রে উঠে আসে। অন্যদিকে মূলধারার চলচ্চিত্রে জেভার সংবেদনশীলতা অনুসন্ধান গবেষণায় কুণ্ড (২০১৭) দেখান, এসব চলচ্চিত্রে নারীবাদ অনুসারে পুরুষ ভোক্তা ও লুকিয়ে দেখার দর্শক। আবার পুরুষ চরিত্রগুলো প্রাধান্যশীল, অসংবেদনশীল ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে নির্মাণ। অন্যদিকে এসব চলচ্চিত্রে নারীকে কোন কোন জায়গায় একটু ভিন্নভাবে দেখালেও নারীবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী নারী এখানে দ্রষ্টব্য, যৌনবস্ত্র এবং পুরুষ মনোভাবাপন্ন দর্শকদের সুড়সুড়ি প্রদান করে। নারীপ্রধান চলচ্চিত্র *আভারকস্ট্রাকশন* ও *অগ্নি* সিনেমাগুলোতেও নারীর রূপায়ণ সম্মানজনক ছিল না।

আবির (২০১৬) বলেন, চলচ্চিত্রে নারীদের মডেলকন্যা, যৌনবস্ত্র, ভোগ্যবস্ত্র, খণ্ডিতরূপে, বিনোদন সামগ্রী, পুরুষের হাতের পুতুল, সুন্দরী, বিয়ের উপকরণ, ঘরের লক্ষ্মী, ভিত্তি, দুর্বল, অক্ষম, মমতাময়ী মা প্রভৃতি রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, অ্যাকশন ঘরনার ছবিতে মুখ্য নারী চরিত্রের পরনে হাই হিল জুতা, কড়া মেকআপ, সংক্ষিপ্ত পোশাক। অন্যদিকে মুখ্য পুরুষ চরিত্রটি পেশিবহুল বাহু, দৃঢ় চোয়াল। এ চলচ্চিত্রে নারীকে সহজলভ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং নারীদের গৃহবধূ হিসেবে ঘরে থাকাই ভালো ধারণা প্রচার করা হয়েছে।

রহমান (২০১৪) দেখান যে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীদের উপস্থাপনকে চরিত্র চিত্রণ বলে অর্থাৎ আমরা শুধু নারীর উপস্থাপিত রূপটি দেখতে পাই কিন্তু তার কোন অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে নারীর যেসব চিত্র ফুটে উঠেছে তা নির্দিষ্ট সময়ের কিছু চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণের চিত্র। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারার চলচ্চিত্রে নারীর নির্মাণ এর কথা উঠে এসেছে।

মুজিবুদ্দেহর চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ গবেষণা প্রবন্ধে গায়েন (২০১২) দেখান, মুজিবুদ্দেহনির্ভর চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন যুদ্ধকালীন ইতিবাচক ভূমিকার চেয়ে নেতিবাচক ভূমিকায় গুরুত্ব পেয়েছে। চলচ্চিত্রে নারীকে ধর্ষিতা, মমতাময়ী, সাহায্যকারী, স্বেচ্ছাচারের প্রতীক, নারীর শত্রু নারী, ধর্ষিতা নারী কলঙ্কমোচনে আত্মহনন অবশ্যম্ভাবী, বাণিজ্যিকরূপে ধর্ষিতা, নিষ্ক্রিয়, চিরায়ত গার্হস্থ্য ভূমিকারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভৌমিক তাঁর *উইমেন অন স্ক্রিন* (২০০৯) গ্রন্থে দেখান, নারীদের প্রথাগত প্রস্থায় চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া তাদেরকে পণ্য হিসেবেও রূপায়ণ করা হয়েছে। স্টেরিওটাইপ তথা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে যথা মা, গৃহিণী, ইত্যাদি রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী পুরুষ ব্যতিরেকে তাদের নিজস্ব পরিচয় প্রদানের বিষয়টি চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়নি।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: সংকটে জনসংস্কৃতি গ্রন্থে নাসরীন ও হক (২০০৮) বলেন, গান হলো পর্নোগ্রাফি প্রদর্শনের প্রধান অবলম্বন। গানের টেক্সট অশ্লীল হতে পারে। আবার কোন গানের টেক্সট যদি আপাতভাবে হৃদয়-মন সংক্রান্ত হয়, তার দৃশ্যায়নে ব্যাপারটা পুরোপুরিই শরীর সংক্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। গানের চিত্রায়ণে নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপনের বর্ণনা দিয়ে বলেন, রঙ্গিন চশমা ছবিতে নায়ক ওস্তাদ জাহাঙ্গীর বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে নিয়ে রঙ্গিন চশমা চোখে দিতেই সে দেখতে পায় বিজ্ঞানীর বোন সুজনা (ক্রাইম রিপোর্টার) বৃষ্টির মধ্যে নাচছে ও গান গাচ্ছে: যায় যায় অন্তর আমার পুড়ে যায়, পিরীতের আগুনে। তার গান আর অনাবৃত অঙ্গের নৃত্যভঙ্গি দেখে মনে হয় আগুন তার মনে নয় শরীরে লেগেছে (নাসরীন ও হক, ২০০৮)।

পারভিন (২০০৫) বলেন, মূলত ঢাকায় চলচ্চিত্রে নারীদের যেসব চরিত্রে দেখানো হয় তার অধিকাংশই প্রশ্নবোধক। নারী অধস্তন, পুরুষ উর্ধ্বতন, নারী যৌনবস্ত্র, সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রতিবাদী মোড়কে পুরুষ এবং নারী পুরুষের সান্নিধ্য প্রত্যাশী।

মূলধারার চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের চোখে নির্মাণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নারী নির্মাতার চলচ্চিত্রে নারীদের কীভাবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে বা নারীর চোখে নারী নির্মাণ বিষয়ে নিবিড় কোন পর্যবেক্ষণ সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে উঠে আসেনি। নারীর দৃষ্টিতে সমাজে নারীর অধিকার কেমন হওয়া উচিত বা নারী তাদের অধিকার নিয়ে কতটা সচেতন তা নারী নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রতিনিধিত্বমূলক একটি চিত্র পাওয়া যাবে। নারী নির্মাতারা তাদের কাজে নারীদের কীভাবে দেখাতে চেয়েছেন বা চান সেটা তাদের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিস্ফুট হবে। তাই নারীদের কাজ নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

২.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায় হলো দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখার অপসংস্কৃতির অবসান ঘটানোর জন্য যে উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচিবোধের চর্চা প্রয়োজন তার অনেক ঘাটতি এখনও রয়েছে; তাই এখনো নারীদের ঘরে-বাইরে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় (অনন্যা, ২০১৯)। গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ পিলার বা স্তম্ভের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষ সমাজের বাস্তব চিত্র দেখার চেষ্টা করে। তাই গণমাধ্যমে রোল মডেল বা আইকন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণমাধ্যমকে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে ‘ইউটোপিয়া’ মনে করে। একজন নারী নির্মাতা চলচ্চিত্রে যত নিখুঁতভাবে নারীর সমস্যা তুলে ধরতে পারবে; পুরুষ নির্মাতার ক্ষেত্রে সেটা কিছুটা হলেও কঠিন। নারী নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্রে নারীদের ইমেজ গঠনে কী ধরনের ভূমিকা রাখছেন তা তাদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বিশদ পর্যবেক্ষণ করলে জানা সম্ভব। বাংলাদেশে যেহেতু নারী নির্মিত সিনেমায় নারীর রূপায়ণ তথা নারী দৃষ্টি নিয়ে গভীর কোন কাজ হয়নি; তাই একজন

গবেষক হিসেবে নারী নির্মিত মূলধারার চলচ্চিত্রে “নারী দৃষ্টি”: একটি গুণগত বিশ্লেষণ শিরোনামে গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে হয়।

২.৩ তাত্ত্বিক কাঠামো

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্ব মূলত চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। কারণ, তত্ত্ব হলো যা বাস্তবের অংশ নয়; কিন্তু বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্য গঠন করা হয় (রহমান, ২০১৫, পৃ. ২৯)। বিদ্যমান গবেষণাটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের দুটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তত্ত্ব দুটি হলো স্টুয়ার্ট হলের Representation theory বা রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব ও নারীবাদী তত্ত্ব (পুরুষ দৃষ্টি ও নারী দৃষ্টি তত্ত্ব)।

ক. রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব: স্টুয়ার্ট হল এর রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব হলো ভাষার মাধ্যমে অর্থ উৎপাদন অর্থাৎ ভাষাকে ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়াকে মানুষের কাছে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা (হক, ২০১৫, পৃ. ২৪)। ভাষার মাধ্যমে অর্থের রেপ্রিজেন্টেশন কীভাবে হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যার জন্য তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এগুলোকে প্রতিফলনকারী (reflective), স্বেচ্ছাকৃত (intentional) এবং নির্মাণমূলক (constructionist) মনোভঙ্গি বলা হয়। প্রতিফলনকারী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাস্তব পৃথিবীর বস্তু, ব্যক্তি, ধারণা বা ঘটনার মধ্যেই অর্থ নিহিত থাকে, ভাষা কেবল তাকে আয়নার মতো প্রতিফলন করে, যেহেতু তা পৃথিবীতে ইতোমধ্যেই রয়েছে। আর স্বেচ্ছাকৃত দৃষ্টিতে লেখক তার ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের সব কিছুর ওপর তার নিজস্ব অর্থ আরোপ করেন। লেখক শব্দের যা মানে হওয়া উচিত বলে মনে করেন শব্দ সেই অর্থই বহন করে।

অন্যদিকে নির্মাণমূলক মনোভঙ্গিতে বলা হয়, বস্তু অর্থ দেয় না: আমরা রেপ্রিজেন্টেশন পদ্ধতিতে, ধারণা ও চিহ্নের মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করি। এই তত্ত্বের অনুসারীরা বস্তুগত পৃথিবীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। কিন্তু বস্তুগত দুনিয়া অর্থ বহন করে না: বহন করে ভাষা পদ্ধতি বা অন্য যেকোনো পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ধারণাগুলো উপস্থাপন করি। সামাজিক কারকরা (actors) তাদের সাংস্কৃতিক ধারণাপদ্ধতি ও তাদের ভাষিক ও অন্য রেপ্রিজেন্টেশন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করেন। এটা করা হয় দুনিয়াকে অর্থবহ করার জন্য ও দুনিয়া সম্পর্কে অর্থবহভাবে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য (হক, ২০১৫, পৃ. ৩৩-৩৫)। এই গবেষণায় রেপ্রিজেন্টেশনের নির্মাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর সংলাপ, ভাষার ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি, গান, নাচ, পোশাক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অর্থ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে নারী নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে নারীর চোখে নারী নির্মাণ তথা নারী দৃষ্টি বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খ. নারীবাদী তত্ত্ব: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ বরাবরই বিভিন্নভাবে নারীর উপর কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখে এমন ধারণার প্রাধান্য দিয়ে নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় (জুনাইদ, ২০১৬, পৃ. ২৯)। নারীবাদী গবেষণা তত্ত্ব সক্রিয়ভাবে গবেষণা এবং যাদের

ওপর গবেষণা হচ্ছে, তাদের মধ্যকার ক্ষমতা ভারসাম্য দূর করতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত এবং সামাজিক অসাম্য দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং এটি গুরু হয় নারীর অবস্থান ও অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে (গায়েন, ২০১২, পৃ. ৩০)।

পুরুষ দৃষ্টি: ফ্রেড (১৯২৩) ও লাকার (১৯৬৬) মনোঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে মালভি এখানে নারীবাদী অবস্থান থেকে বিশেষত হলিউডের মূল ধারার ন্যারেটিভ সিনেমায় নারীর উপস্থাপন ও পুরুষের ক্ষমতার বিষয়টি তার “পুরুষ দৃষ্টি” তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন (হক, ২০২২, পৃ. ৩৪)। লরা মালভি এর *ভিজুয়াল প্রেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। মালভি তার পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বে বলেন, মূলধারার বর্ণনামূলক চলচ্চিত্রে মূলত নারীকে দেখানো হয় যৌনবস্তু হিসেবে এবং পুরুষকে দ্রষ্টা হিসেবে। মালভি তার তত্ত্বে আরও বলেন, পর্দায় নারীর যে উপস্থিতি দেখানো হয় তা নির্মিত হয় পুরুষের ভালো লাগাকে কেন্দ্র করে। সেখানে ক্যামারার দৃষ্টি, সিনেমায় নায়কের দৃষ্টি এবং দর্শকের দৃষ্টি এই তিন দৃষ্টিই থাকে পুরুষের। পুরুষের তৃপ্তির জন্যই নারীকে উপস্থাপন করা হয়। কখনো কখনো ভিন্ন (মূলধারার বাইরে) ধারার ছবিতে নারী চরিত্রকে শক্তিশালী হিসেবে উপস্থাপন করেছে সেখানেও কখনো কখনো দেখা যায় নারীর শক্তিশালী চরিত্র প্রাধান্য দেয়ার বদলে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাকে দুর্বল আর যৌনাবেদনময়ী হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারী দৃষ্টি: লরা মালভি এর পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বটি প্রকাশের পর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে তাহলে নারী দৃষ্টি কী? এরপর থেকেই তাত্ত্বিকরা নারী দৃষ্টি খোঁজার চেষ্টা করেন। নারী দৃষ্টি হলো অপকেন্দ্র শক্তির মতো। অর্থাৎ এটি ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও কাক্সিকৃত কাঠামোর বিরুদ্ধে কাজ করে (লভ্যাট, ২০১৩, পৃ. ২০৫)। নারী দৃষ্টি বলতে সর্বোপরি ক্ষমতার পুরুষতান্ত্রিক অসমতা দূরীকরণ এবং সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি করাকে বুঝায় (মালেকী, ২০১৩, পৃ. ২)। এই ঘরানার তাত্ত্বিকরা নারী দৃষ্টি বলতে বুঝাতে চেয়েছেন চরিত্রের দিকে না তাকিয়ে (look at) বরং তাকে অনুভব (feeling seeing) করার দৃষ্টিতে দেখা। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে কোন চরিত্রকে দেখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার চেয়ে যেন চরিত্রকে নিয়ে এক ধরনের অনুভব তৈরি হয় সেটার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এ যেন পুরুষের চোখের বদলে নারীর চোখে মানবিক মানুষ হিসেবে নারী-নির্মাণ। অর্থাৎ দর্শককে পর্দায় উপস্থাপিত নারীর চাহিদা এবং চাওয়াটা অনুভব করা; নারীকে প্রধান চরিত্রে উপস্থাপন, পুরুষ কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের ব্যবহৃত দৃশ্যবস্তু হিসেবে না ভাবা এবং নারী পুরুষের সমানাধিকার এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা (আয়ালা, ২০২১)।

নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব নারী নির্মাতাদের, নারী কাহিনিকারদের অধিকতর অংশগ্রহণের ওপরও জোরারোপ করে। কোন ধরনের দর্শক কীভাবে এবং কেন দৃষ্টির তৃপ্তি অর্জন করে। পুরুষের মতো কখনো নারীও দৃষ্টির তৃপ্তি অর্জন করে কিনা এবং কখনো কোন ছবির কাহিনিতে শক্তিশালী নারী চরিত্র দেখানো হলেও বিভিন্ন চলচ্চিত্র কৌশল ব্যবহার

করে সেই ভিন্ন ধরনের নারী চরিত্রও গতানুগতিক নারী চরিত্রের মতো করে ফেলা হয় তা নারীবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে (জুনাইদ, ২০১৬, পৃ. ৩০)। নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্বের আলোকে নারী নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্রে নারীদের কোন দৃষ্টিতে দেখেন বা সমাজের তথাকথিত পুরুষ দৃষ্টির বাহিরে যেয়ে নারী দৃষ্টি ধারণার উদাহরণ তৈরি করতে সচেষ্ট কী না তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

যেকোনো গবেষণা বিশেষ করে সামাজিক গবেষণায় পদ্ধতিগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা।

৩.১. সমগ্রক ও নমুনায়ন

গবেষণা সমগ্রক হলো গবেষণার বিবেচ্য বিষয়ের সকল তথ্য। সমগ্রক থেকে নিয়মতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া হলো নমুনায়ন। অর্থাৎ নমুনায়ন হলো কোন বৃহৎ অংশের নির্বাচিত অংশ যা পুরো বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। নমুনায়ন সাধারণত গবেষণা প্রকল্পের ধরন, উদ্দেশ্য, গবেষণা সময় ও আর্থিক বিষয়ের দিকে নজর রেখে নির্বাচন করতে হয়। নমুনায়ন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন। বিদ্যমান গবেষণা কর্মটির নমুনা নির্বাচনের জন্য নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী নির্মাতার সকল স্বল্পদৈর্ঘ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত নারী পরিচালক নির্মিত পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনায়নকৃত সিনেমাগুলো হলো: নারগিস আক্তার নির্মিত *মেঘলা আকাশ* (২০০১), নির্মাতা কবরীর *আয়না* (২০০৬), মেহের আফরোজ শাওন পরিচালিত *কৃষ্ণপক্ষ* (২০১৬), রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত *মেড ইন বাংলাদেশ (শিমু)* (২০১৯) ও চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত *বিশ্বসুন্দরী* (২০২০)।

সিনেমা পাঁচটি নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

- ক. খ্যাতিমান নারী নির্মাতাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
- খ. আলোচিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
- গ. অনেকাংশে নারী কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র
- ঘ. নারীবাদী চলচ্চিত্র

৩.২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

নির্বাচিত গবেষণা বিষয়ের উপর নমুনাসমূহ থেকে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণের জন্য স্বীকৃত

পদ্ধতি হলো বর্ণনতত্ত্ব (Film Narratology)। এই গবেষণায় চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। জেরার্ড জেনেট চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। জেরার্ড তার ন্যারেটিভ ডিসকোর্স বইতে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনতত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণের কথা বলেছেন। জেরার্ড প্রণীত ন্যারেটিভ ডিসকোর্সে বলা হয় “ন্যারেটিভ” ধারণাটি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত (জেনেট, ১৯৮০)। বক্তব্য (recit), কাহিনি (histoire) এবং বর্ণন কৌশল (narration)। জেনেট চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্বের যে কাঠামো প্রণয়ন করেছেন, তার আলোকে নমুনাকৃত চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৩ তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত সিনেমাগুলো (অনলাইন থেকে সংগৃহীত) বার বার দেখে পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনীয় নোট নেওয়ার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. তথ্য উপস্থাপন এবং ফলাফল বিশ্লেষণ

মেড ইন বাংলাদেশ (শিমু) চলচ্চিত্র: মেড ইন বাংলাদেশ রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত একটি নারী কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র। ছবিটি ২০১৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে। ধারাবাহিকভাবে ২০২২ সালের ১১ মার্চ ছবিটি শিমু নামে বাংলাদেশে মুক্তি পায়। ২৩ বছরের তরুণী এক পোশাক শ্রমিককে কেন্দ্র করে সিনেমাটি নির্মিত। শিমু পোশাক শিল্প কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য বেতনসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় শিমু। অধিকার সচেতনার জায়গা থেকে কারখানার কর্তৃপক্ষ ও নিজ স্বামীর অমতে অধিকার ও ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায়ের জন্য নিজ সহকর্মীদের নিয়ে একটি সংঘ বা সমিতি গঠনের চেষ্টা করে। অধিকার আদায়ে শিমু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিজেদের পথ খুঁজে পেতে নারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমিতি গঠন করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে।

চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণে নারী দৃষ্টি

বিদ্যমান কাঠামোর বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন: নারী-পুরুষ উভয় সমাজের অনুষঙ্গ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমানাধিকার তথা বিদ্যমান কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা দীর্ঘদিন ধরে কথা বলে আসছেন। মেড ইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে গার্মেন্টসকর্মী শিমুরা তাদের বকেয়া বেতনের জন্য পোশাক কারখানায় প্রবেশ করতে গেলে নিরাপত্তাকর্মীর বাধার সম্মুখীন হয়; কিন্তু প্রতিবাদ করে তারা জোরপূর্বক ভিতরে প্রবেশ করে এবং বকেয়া বেতনের টাকা পায় কিন্তু ওভারটাইমের টাকা চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ তা দিতে নারাজ হলে আবারও শিমুরা প্রতিবাদ করে। অন্যদিকে ওভারটাইমে কাজ করতে যেয়ে গভীর রাত হয়ে যাওয়ায় ম্যানেজার নারী শ্রমিকদের কারাখানাতাই

রাত্রি যাপন করতে বলে কিন্তু বিপত্তি হয় তখন যখন মাথার উপর চলন্ত ফ্যানগুলো বন্ধ করে দেয়। তাদের প্রতিবাদের মুখে ম্যানেজার আবার ফ্যানগুলো চালু করতে বাধ্য হয়।

সমিতির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের স্বাক্ষর সম্বলিত ফাইল নিয়ে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলে সেখানেও কর্তৃপক্ষের রোযানলে পড়ে কিন্তু শিমুরা তার প্রতিবাদ করে এবং কৌশলে কাজটি করে ফেলে। অধিকার বঞ্চিত শিমুরা শিমুর নেতৃত্বে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীরা তাদের প্রাপ্য পেতে প্রতিবাদ করে সমাজের বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়। এই বিষয়টি নারী দৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নারী স্বাবলম্বী: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ঘরের “শোপিস” বা ঘরের “কুনো ব্যাঙ” হয়ে থাকবে। এই ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে নারী পোশাক কারখানায় কাজ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে দেখতে চায়। শিমুর স্বামীর কোন কাজ নেই। নারী হয়ে শিমু সংসারের সকল ব্যয়ভার বহন করতে পারে তথা নারীকে মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিমুর এক বান্ধবী বলে “বিয়ে করে টাকা ছেড়ে চলে যাব” এ কথা শুনে শিমু বলে “... পরে বুঝবি”। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা স্বাবলম্বী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

নারীর আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ: অধিকার সচেতনের জায়গা থেকে পোশাক শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে স্বামীর মতের বিরুদ্ধে যেয়ে মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় শিমু সমিতি করতে চায়, স্বামী কাজ পেলে শিমুকে গার্মেন্টসের কাজ করতে বাধা দেয় কিন্তু শিমু এসব বাধা পেরিয়ে শিমু কাজ করে এবং সমিতিও করে। তবে গার্মেন্টসে কাজ করতে গেলে শিমুকে আগের চেয়ে শালীন হতে হবে যা স্বামীর ইচ্ছা। এখানে নারীর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের পথ উন্মোচনের পর্যায়ে আছে নির্দেশ করা হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন: বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে নারী ঘরের লক্ষ্মী বা নারী ঘরের কাজ করবে। কিন্তু এই চলচ্চিত্রে শিমু কারখানা থেকে কাজ শেষে বাসায় ফিরলে স্বামীকে (সোহেল) বলতে শোনা যায় “তুই গুয়ে থাক আমি ভাত রান্না করতেছি।” সোহেল শিমুর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে গুনে কিন্তু আবার রেখে দেয়। এখানে নারীর উপার্জনের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নারীকে গণ্যবাধা উপস্থাপন থেকে সরে আসতে দেখা যায়।

পুরুষ দৃষ্টি ও পোশাক: গল্পের মেজাজ ও অর্থ-কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখেই চলচ্চিত্রে কস্টিউমের ব্যবহার হয়েছে। অযাচিতভাবে কোন নারী চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়নি। পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বের আলোকে চলচ্চিত্রে নারীকে পুরুষের দ্রষ্টব্য হিসেবে

উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছার ত্রীড়ানক হিসেবে নারীকে রূপায়ণ করা হয়। মেড ইন বাংলাদেশ সিনেমায় পুরুষ দৃষ্টির বলিষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায়নি। তবে নারী পুরুষকে ইঙ্গিত করে বলে, “... দেখ আমাকে কেমন লাগছে।”

বিশ্বসুন্দরী চলচ্চিত্র: নারী পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী নির্মিত *বিশ্বসুন্দরী* চলচ্চিত্র ২০২০ সালে মুক্তি পায়। নারী কেন্দ্রিক সিনেমাটি সামাজিক জঁরার। ফাতেমা (চম্পা) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি ক্যাম্পে ৪০ দিন আটক ছিল যেটি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সবাই অজ্ঞাত। এদিকে ফাতেমার ছেলে স্বাধীন (সিয়াম) এর সুন্দর ত্বকের অধিকারী মেয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও সুন্দর মনের প্রতি আগ্রহ থাকে। সেই কারণে শোভা (পরীমণি) মায়ের কথাতে স্বাধীনের কাছে নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। এতে স্বাধীন সুন্দর ত্বকের অধিকারী মেয়ের ভিতরে সুন্দর মনের সন্ধান পায়। এভাবে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কে গড়ে ওঠে কিন্তু শোভার বাবা তাঁর পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে চান। স্বাধীনকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে শোভার বাবা তাঁর (মা ফাতেমা) সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে অর্থাৎ স্বাধীনের বাবার পরিচয় নিয়ে কথা ওঠে। এসব বিষয় স্বাধীন তাঁর মাকে বললে মা বাসা থেকে রাগ করে চলে যায়। এক পর্যায়ে মা ফাতেমা বীরঙ্গনাদের অনুষ্ঠানে বীরঙ্গনা হিসেবে বক্তৃতা করলে সেটা টিভিতে সম্প্রচারিত হয়। এই খবর পেয়ে স্বাধীন অনুষ্ঠানে যেয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে, “আসল সুন্দর মনের মানুষ তো আমার ঘরেই ছিল, তুমি আমার বিশ্বসুন্দরী।”

চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণে নারী দৃষ্টি

পুরুষের সমান উচ্চতায় নারীর স্থান: সিনেমার কাহিনির শুরুতেই অফিসের এক কর্মকর্তা বলে, “আজ নাকি স্যার আসবেন না”; অন্য কর্মকর্তা বলে, “স্যার আসে নাই তো কি হয়েছে; ম্যাডাম তো আছেন।” স্বাধীন বলে, “... মাই মাদার সামথিং এলস্ (my mother something eles)।” অর্থাৎ পরিবারে পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে (মৃত্যুর পর) নারী সব কিছুকে সামলিয়ে নিতে পারার সক্ষমতার প্রকাশ পায়। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে নারীকে পুরুষের সমমনা তথা নারীকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারী দৃষ্টিতে বলা হয়: নারী পুরুষ উভয় মানবিক মানুষ; নারী বা পুরুষ বলে কারও বেশি অধিকার বা বেশি সক্ষমতা আছে বলে মনে না করা।

নারী শ্রদ্ধার পাত্র: সিনেমায় গতানুগতিক উপস্থাপনে নারী হয় পুরুষের দ্রষ্টব্য, ভোগ্যবস্তু ও বিনোদিনী। কিন্তু *বিশ্বসুন্দরী* সিনেমায় নারীকে গৎবাঁধাভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ফাতেমা শোভাকে জিজ্ঞেস করে “স্বাধীন কোন নারীকে, তোমার কোন কথাকে কিংবা তোমার পরিবারকে কিংবা তোমাকে অসম্মান করেছে”? উত্তরে শোভা বলে, “না।” আবার ফাতেমার স্বামীকে বলতে শোনা যায়, “তোমার সব সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান

জানাই।” এসব বক্তব্যের মাধ্যমে নারী শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা সমাজে পুরুষই শুধু শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচ্য হবে তা নয় বরং নারীও মানবিক মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে যা নারী দৃষ্টি তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য।

নারী সক্ষম: সিনেমার কাহিনির এক পর্যায়ে, ফাতেমার স্বামী বলে, “ফাতেমা এক অদ্ভুত শক্তির নাম; তুমি জান যে ভয়কে কীভাবে জয় করতে হয়।” আবার শোভার কাছে মায়ের উক্তি, “এই ফাতেমাই আমাকে তোর বাবার কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে।” পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমাজের অন্য দশজনকে সহযোগিতা করতে পারে বা অন্য নারীকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকল থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে এমন চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

নারী মানবিক: “সবার আগে আত্মাকে (soul) ভালোবাসা জরুরি; কালো, বেঁটে-লম্বা-ফর্সা সেসব কোন বিষয় না”, ফাতেমার কণ্ঠে এই বক্তব্য নারীকে মানবিক মানুষ হিসেবে ভাবার ইঙ্গিত দেয়। আবার স্বাধীন যেন শোভার ভিতরের দিকটির দিকে নজর দেয় সে জন্য শোভা নিজের ত্বকে কালো (dark) মেক-আপ করেছে। নারী সুন্দর বা কালো সেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ না বরং নারী মানবিক মানুষ এই বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে সিনেমাটিতে যা নারী দৃষ্টির অন্যতম দিক বটে।

নারীর সিদ্ধান্ত পুরুষে: গতানুগতিক উপস্থাপনে পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের বাইরে যেতে পারে না দেখানো হয়। পরিবারে পুরুষ সদস্যকে ভয় পেয়ে নারী সদস্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও এক পর্যায়ে নিজের ইচ্ছাকেই অগ্রগামী রেখে পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে বের হতে চায়। *বিশ্বসুন্দরী* চলচ্চিত্রেও এমনটি দেখা যায়। শোভা বাবার পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করবে বলে প্রাথমিক মত প্রকাশ করলেও মাকে শোভা তাঁর ইচ্ছার কথা বলে, কিন্তু, “তোর বাবা আমার কথা শুনবে না” মায়ের এমন উক্তির পরে নিজেই পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করবে বলে মত প্রকাশ করে এবং নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়।

পুরুষতান্ত্রিকতার চিহ্ন: “... কবিতা পড়লেই ববিতা হওয়া যায় না; এর চেয়ে ঘর সংসারে মন দাও; কাজে লাগবে।” স্বামীর এমন বক্তব্যের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু, স্বামীর এমন কথার পরেও স্বপ্ন কবিতালায়ে নিজেকে যুক্ত করে স্ত্রী। এই চিত্রায়ণে নারী পুরুষতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

ক্যামেরার দৃষ্টি ও পোশাক: *বিশ্বসুন্দরী* সিনেমায় ক্যামেরার দৃষ্টি ছিল নারী-পুরুষ মিশ্রিত। কখনো নারীকে পুরুষের দৃষ্টব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার কখনো নারীকে পুরুষের সমমনা বা মানবিক মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। গল্পের প্রয়োজনে পোশাক অনেকটা যথোপযুক্ত তবে কিছু কিছু দৃশ্যে পুরুষের দৃষ্টিতে পোশাকের ব্যবহার হয়েছে।

পুরুষ দৃষ্টি: বিশ্বসুন্দরী সিনেমাতে পুরুষ দৃষ্টির উপস্থিতি লক্ষণীয়। ইমা (পার্শ্ব নায়িকা চরিত্র) স্বাধীনকে জিজ্ঞেস করে যে, তাকে কেমন লাগছে? স্বাধীন বলে সুন্দর, ইমা বলে, হট না!। আবার কিছু চিত্রে যেমন শোভাকে সিনেমায় পরিচয় করানো হয় ক্যামেরার অশোভনীয় চোখের মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্টি প্রকাশের মধ্যদিয়ে।

কৃষ্ণপঙ্ক চলচ্চিত্র: প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস কৃষ্ণপঙ্ক অবলম্বনে মেহের আফরোজ শাওন নির্মাণ করেন কৃষ্ণপঙ্ক চলচ্চিত্র। ক্লাসিক্যাল ধারার চলচ্চিত্রটি ২০১৬ সালে মুক্তি পায় এবং সেই বছরেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে চলচ্চিত্রটি। একমাত্র বোন জেবার (তানিয়া হক) বিয়ের পর মা-বাবাকে হারিয়ে ছোট্ট মুহিব (রিয়াজ) তার দুলাভাইয়ের বাড়িতেই বেড়ে ওঠে। এ সময় মুহিবকে দুলাভাইয়ের কঠিন অনুশাসনের মুখোমুখি হতে হয়। সিনেমায় সময় গড়ালে মুহিবের জীবনে ভালোবাসা স্পর্শ করে অরুণ (মাহিয়া মাহি) হাত ধরে। অরুণকে সঙ্গে নিয়ে মুহিব দেখতে শুরু করে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন। গোপনে তাদের বিয়েও হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন বুনন সম্পূর্ণ হয়নি।

চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণে নারী দৃষ্টি

নারী পুরুষের অধীন: জেবার বিয়ে হয় এক অভিজাত বুর্জোয়া পুরুষের সাথে। রোবটিক শ্রেণির এই পুরুষ পরিবারে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। “ভাই কখনো একা রাতে ঘুমায়নি” এই বলে জেবা ছোট্ট মুহিবকে নিজের সাথে রাখার কথা বললে স্বামী চোখ গরম করে বলে, “আজ থেকে সে একাই থাকবে; এসব বিষয় নিয়ে আর কোন কথা শুনতে চাই না” বলে নারীর উপর কর্তৃত্বপরায়ণ হয়। আবার অরুণ বিয়ের কথা উঠলে স্ত্রী স্বামীকে বলে, “অরুণকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত না”; স্বামী বলে, “অরুণ বাচ্চা মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে।” অন্য দিকে অরুণ বলে পৃথিবীর সব স্ত্রীই তার স্বামীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। গোপনে বিয়ে করার পর স্বামী সম্পর্কে অরুণ বলে, পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। এসব বক্তব্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পায়।

নারী ঘরের শোপিচ মাত্র!: পুরুষশাসিত সমাজে নারী পরিবারের শোপিস মাত্র। নারীকে পুরুষ বিয়ে করে শোপিস হিসেবে সাজিয়ে রেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে। জেবার স্বামী বলে, “গরীব ঘরে বিয়ে করেছি তোমার সৌন্দর্য দেখে; কাপড় খুলে আস, তোমাকে দেখি, আলোর নিচে দাঁড়াও।” এসব বক্তব্যে পুরুষ দৃষ্টির চমৎকার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। মালভি তার পুরুষ দৃষ্টি তত্ত্বে বলেন, মূলধারার বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্রে মূলত নারীকে দেখানো হয় যৌনবস্ত্র হিসেবে এবং পুরুষকে দ্রষ্টা হিসেবে।

পরিবারের নাটাই পুরুষের হাতে: পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ সংসারের সকল আর্থিক অবস্থার দেখভাল করে অর্থাৎ পরিবারে আর্থিক ক্ষমতা পুরুষ সদস্যের কাছে ন্যস্ত থাকে। মুহিব তার বুবুর কাছে দুই হাজার টাকা চাইলে জেবা বলে, “... সংসারের টাকা আমার হাতে থাকে না।”

পিতৃতান্ত্রিক শিকল ভাঙ্গার চেষ্টা: রোবটিক স্বামীর দ্বারা নিষ্পেষিত স্ত্রী একটা সময় শিরদাঁড়া উঁচু করে নির্যাতনের প্রতিবাদ করে। জেবা বলে, “আমার ধারণা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি উঁচু পর্যায়ের না, দুর্ভাগ্য যে রূপবতী হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, তোমরা সুন্দরী মেয়ের লোভ সামলাতে পারলে না, আমাকে বউ করে ঘরে আনলে, ... সারা জীবন থাকতে হতো তোমার মতো একটা কীটের সাথে।” আবার অরুণ মা বাবাকে বলে, “তুমি এখন আর পুলিশের আইজি না, এটা তোমার পুলিশের হেডকোয়ার্টার না; সবাইকে তোমার অধীন মনে করো না।” এসব বক্তব্য এবং ইমেজ পুরুষতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ, যা থেকে বের হয়ে আসতে চায়।

আয়না চলচ্চিত্র: সারাহ বেগম কবরী নির্মিত আয়না সিনেমা ২০০৬ সালে মুক্তি পায়। নারীকে উপজীব্য করে নির্মিত সিনেমাটি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারও অর্জন করে। গরীব বয়্যাতির সুন্দরী মেয়ে কুসুম। নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলে অন্যের প্ররোচনায় পড়ে কুসুমকে এলাকার এক লম্পট ছেলের (রমিজ) সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হয় বাবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। সজনহারা কুসুম জীবিকার তাগিদে শহরে পাড়ি জমায়। শহরে বাসায় বুয়ার কাজ করতে গেলে সেখানে পুরুষ মালিকের কুনজরে পড়ে। বুয়ার কাজ ছেড়ে গার্মেন্টস কর্মীদের সহযোগিতায় গার্মেন্টসে কাজ নেয় কুসুম। সেখানে দোলন নামের পুরুষের সাথে পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরে তা বিয়েতে গড়ায়। কিন্তু বিয়ের রাতেই রমিজ কুসুমের মুখে এসিড নিক্ষেপ করে। মানবাধিকার কর্মীর সহায়তায় এসিড নিক্ষেপকারীর শাস্তি নিশ্চিত হয়। পোড়া মুখমণ্ডল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে স্বামী দোলনের আপ্রাণ চেষ্টা। এভাবেই নারীর অধিকার সচেতনতা বিষয়ক গল্পটি এগিয়ে যায়।

চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণে নারী দৃষ্টি

নারী মানুষ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গায়ের রং কালো মেয়েদের অবহেলার পাত্র হতে হয়। এই সিনেমাতে নারী অবহেলিত হলেও নারীকে অনেকাংশে মানবিক মানুষ হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তুলিকে দেখতে আসা পুরুষদের একজনকে বলতে শোনা যায়, “মাইয়াডার গায়ের রঙ একটু কালো হলেও চেহারাটা বেশ মিষ্টি, আমারতো ভালোই লাগছে।” তুলির বিয়ের সময় যৌতুক দাবি করলে বান্ধবী কুসুমের

কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, “বিয়া যেন কোরবানীর গরুর হাট, পোলারে বিয়ের বাজারে বেচতে আসছে।” বাবা কুসুমের বিয়ের কথা বললে, কুসুম বলে “... যৌতুক দিয়ে বিয়ের মধ্যে আমি নাই; ঝাড়ু মারি ওসব প্রস্তাবের কপালে।” পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে নারী। এর মাধ্যমে নারীকে মানবিক মানুষ হিসেবে দেখার ইঙ্গিত দেয়। আবার কুসুমকে দেখে হেলাল (ভবঘুরে) বলে, “মালটা সেই”; তার উত্তরে দোলন বলে, “মেয়েদের মাগী, মাল এসব বলা যাবে না; মা-বোন বলতে হবে।”

পুরুষের ভোগ্যবস্তু: লরা মালভি তার “পুরুষ দৃষ্টি” তত্ত্বে বলেন, সিনেমায় নারীর যে উপস্থিতি দেখানো হয় তা নির্মিত হয় পুরুষের ভালো লাগাকে কেন্দ্র করে। *আয়না* চলচ্চিত্রে কুসুম তার বান্ধবীকে নিয়ে দোকান থেকে কিনে ফেরার সময় ক্যামেরা দৃষ্টি পড়ে কুসুমের কোমর দোলানোর ওপর। এ যেন দোকানে বসে থাকা যুবক রমিজের চোখ। আবার সেই যুবক দেহ ভোগের বিনিময়ে মেয়েদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে। গার্মেন্টসকর্মী মেয়েদের টাকার বিনিময়ে ভোগ করা যায়। ভবঘুরে যুবককে বলতে শোনা যায়, “এই যাবি! মেয়ে বলে, টাকা নগদ।” আবার অসহায় কুসুম শহরের বাসা বাড়িতে গৃহের কাজ করতে গেলে গৃহের কর্তা তাকে ভোগ করতে চায়। এসব বক্তব্যে ও সিনেমায় নারীর ইমেজে নারীকে ভোগ্যবস্তু বা পুরুষের দ্রষ্টব্য হিসেবে উপস্থাপন বুঝায়।

দোষারোপের তীর নারীর দিকে: তথাকথিত সমাজের মতো নারীদের দোষারোপের চিত্রও *আয়না* সিনেমায় ফুটে ওঠে। এলাকার সবার নানা তাঁর বউয়ের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, “আগা দেয়ার মুরদ নাই, শুধু মুরগির মতো করকড়ায়।”

নারী দৃষ্টি: শহরের বস্তিতে ঘর ভাড়ার টাকা উত্তোলন করে সম্পূর্ণ টাকা স্বামী তুলে দেয় তার বউয়ের হাতে। নারী গার্মেন্টসকর্মী কারখানায় কাজ করে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে পুরুষ সঙ্গীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে জীবনযাপন করতে পারে এমন চিত্র *আয়না* সিনেমায় দেখা যায়। আবার সিনেমায় কলাকুশলীদের পোশাক গল্পের খাতিরে নির্বাচন করা হয়েছে। নারী অধিকার সচেতন প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জোর চেষ্টা করেন পরিচালক (সিনেমায় নিজেই অধিকারকর্মী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন)।

মেঘলা আকাশ চলচ্চিত্র: বিখ্যাত নারী নির্মাতা নারগিস আক্তার নির্মিত *মেঘলা আকাশ* চলচ্চিত্র ২০০১ সালে মুক্তি পায়। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটি এইচআইভি সচেতনতা ও প্রতিরোধের কাহিনি নিয়ে নির্মিত। *মেঘলা* (মৌসুমী) মামার বাড়িতে বেড়ে ওঠে। জোর করে নিজেদের পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে মেঘলা তাঁর পছন্দের মানুষের কাছে চলে যায়। কিন্তু সেই মানুষ

তাকে গ্রহণ করতে অপরাগতা প্রকাশ করলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মানুষের সহায়তায় জীবন রক্ষা হয়। পরবর্তীকালে খারাপ লোকের খপ্পরে পড়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়া মেঘলার পতিতালয়ে ঠাই হয়। সেখানে বিদেশ ফেরত এক ভদ্রলোকের সাথে মেঘলার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে ভদ্রলোক তাকে বিয়ে করে এবং পতিতালয় থেকে বের করে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দুজনের শরীরেই এইচআইভি রোগ ধরা পড়ে।

চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণে নারী দৃষ্টি

নারী অলঙ্ঘী: পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ দেহিতে বিয়ে করলে কোন জাত যায় না কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তার উল্টো। নারীর বয়স বেশি হলে বিয়ে হবে না বরং সে পরিবারের জন্য হয়ে যায় অলঙ্ঘী। মেঘলার বিয়ে হতে দেহি হওয়ায় মেঘলা যেন পরিবারের জন্য অলঙ্ঘী।

নারীর সিদ্ধান্ত অন্য নারী-পুরুষে: বিভিন্ন চড়াই উৎড়াইয়ের পর মেঘলার বিয়ের সম্বন্ধ আসলে মামা তার স্ত্রীকে বলে, “বিয়ে নিয়ে মেঘলার মতামত নেওয়ার দরকার ছিল না?” মামী তখন বলে, “মেয়ের মতামত কেন লাগবে।” ডাক্তারকে বলতে শোনা যায়, “নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন ক্ষমতা তো নারীদের নেই; বিয়ে কবে হবে বা বাচ্চা কখন হবে; এমনকি কনডম ব্যবহার করতে পারবে কিনা সে সিদ্ধান্তও নারী নিতে পারে না; পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়।” নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো স্বাধীন হতে পারেনি বরং তার সিদ্ধান্ত পরিবারের পুরুষ কোন কোন ক্ষেত্রে নারী সদস্যের উপর ন্যস্ত।

নারীর সুন্দর দেহ ভোগের: সাধারণত চলচ্চিত্রে নারী হয় ধর্ষিতা, যৌনবস্ত্র বা পুরুষের দৃশ্যবস্ত্র প্রভৃতি। মেঘলা আকাশ সিনেমাতেও তার খুব একটা ব্যতিক্রম হয়নি। মেঘলা বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে প্রেমিকের শরণাপন্ন হয় কিন্তু প্রেমিক তাকে ফিরিয়ে দেয়। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। সে সময় একদল পাচারকারী তাকে জীবননাশ থেকে রক্ষা করে কিন্তু তখন তাদেরকে বলতে শোনা যায়, “এত সুন্দর দেহ গাড়ির নিচে কেন দিতে চাও”, আবার পতিতালয়ে মেঘলা সম্পর্কে সর্দারনী বলে “... ওকে যে এনে দিয়েছে তারে আমাকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে”, মেঘলাকে যে ভোগ (সাধারণ অর্থে) করতে চায় সে বলে, “টাকাগুলো রাখেন কিন্তু আজ থেকে ওর ঘরে আর কেউ যেতে পারবে না।” এসব বক্তব্যে এবং ইমেজে নারী যে পুরুষের ভোগ্যবস্ত্র তা ফুটে ওঠে।

ক্যামেরার দৃষ্টি ও পোশাক: মেঘলা আকাশ সিনেমাতে পুরুষের দৃষ্টি পরলিঙ্কিত হয় অর্থাৎ লরা মালভির পুরুষ দৃষ্টি বা মেল গেইজ দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ পাওয়া যায়।

পুরুষকে তৃপ্ত করতে পতিতালয়ে নারীদের অযাচিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। “... তর মতো সুন্দরী মেয়ের পায়ের তলে আমি আমার সব কিছু চাইলা দিতে পারি”, “... আগে তুই আমার লগে চল তারপর তুই যা চাইবি তাই পাবি”। গানের দৃশ্যেও পুরুষ দর্শকের দৃষ্টিতে ক্যামেরা দৃষ্টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজে লাগানো হয়েছে। নারীকে অপ্রসঙ্গিক পোশাকেও উপস্থাপন হয়েছে কখনো কখনো।

নারী দৃষ্টি: নাসরিন আক্তার নির্মিত মেঘলা আকাশ সিনেমাতে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙ্গার একটি চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সিনেমার কিছু সংলাপ দেখলে তা স্পষ্ট হবে। “... আজ যদি তোমার বাবা বিয়ের রেজিস্ট্রি করিয়ে রাখতো, কাবিননামা থাকতো, তাহলে তোমার স্বামী এত সহজে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারতো না।” “... আইন করে দিলেই তো সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে না; নারীর নিজেকে সচেতন হতে হবে, নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে।” “... এজন্য দরকার শিক্ষা; আজ সারা দুনিয়ায় প্রমাণিত যে, কোন সঠিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ না নারীদের সমস্যা সমাধান হবে ...।” “এইগুলো কেন আনছেন; কেন আমাকে সাজাতে চান, কেন সুন্দর করে দেখতে চান, আমারে ফুসলায়া আমার দেহটাকে নষ্ট করতে চান?” “... আরেক পুরুষ দেখলাম সাহায্য করার নাম করে পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেয়; আরেক পুরুষ আপনি ...।” “তোমরা চরিত্রহীনা বললে নারী পুরুষকে থাপ্পর মারতে দেখা যায় এবং বলে চরিত্রহীনা বানাইছেন আপনারা ...।” “তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে; ঠিক রজনীগন্ধার মতো, আমি মেঘলাকে বিয়ে করব ... মেঘলা শুধুই মানুষ।”

৫. পর্যালোচনা

নারী পরিচালকের বক্তব্যে বিভিন্ন সময় উঠে আসে যে একজন নারীই তার ভালো-মন্দ বা নারীর অধিকারের বিষয়টি যতটা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারবে একজন পুরুষের পক্ষে ততটা সম্ভব না। এই বক্তব্যকে ধারণ করেই নারী নির্মিত বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ ও নারী দৃষ্টি বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুষ নির্মিত সিনেমাগুলোতে নারীর চিত্রায়ণ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে। অর্থাৎ নারী পুরুষের ত্রীড়ানকে পরিণত হয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রথিতযশা পাঁচজন নারী নির্মাতাদের সিনেমা বিশ্লেষণ করে কিছু তুলনামূলক চিত্র অবশ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে নারীকে “মানুষ” হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থাকে “বৃদ্ধাঙ্গুল” দেখিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টির দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এই নারী নির্মাতারা। নারীকে স্বাধীন, পুরুষের সমরূপ, মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ রূপে উপস্থাপন করেছেন। নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির দর্শককে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত নারীর আসনে নিজেকে বসিয়ে অনুভব

করতে পারার নানান উপাদানের সমারোহ ঘটিয়েছেন। মেহের আফরোজ শাওন ও নাসরিন আক্তার পরিচালকদ্বয় তাদের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণে তথাকথিত পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তবে এ সকল নির্মাতাদের নির্মাণেও নারীর চিত্রায়ণে পরিবর্তন লক্ষণীয়। তারাও দর্শকের কাছে এমন কিছু আধেয় নির্ভর চলচ্চিত্র উপহার দিচ্ছে যেন নারীকে নিয়ে “অনুভব” করতে পারে বা এক ধরনের অনুভূতি কাজ করে।

অন্যদিকে রুবাইয়াত হোসেন চয়নিকা চৌধুরি ও কবরী এর চলচ্চিত্রে নারী দৃষ্টির প্রাধান্য দেখা যায়। তবে এই শ্রেণির নির্মাতারাও পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বের হতে পারেনি। নমুনাকৃত পাঁচটি চলচ্চিত্রেই পুরুষতান্ত্রিকতার শিকল ভাঙ্গার জোর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

রুবাইয়াত হোসেন নির্মিত মেড ইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণের চিত্র তথাকথিত নির্মাণের চেয়ে বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয় তথা “নারী দৃষ্টি” উপস্থাপিত। নারীবাদী হিসেবে পরিচিত এই চলচ্চিত্রকার তাঁর চলচ্চিত্রে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীকে অধিকার সচেতনরূপে নির্মাণ, নিজের ইচ্ছা প্রকাশে দৃঢ় থাকা, নারীকে স্বাবলম্বীরূপে, নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং কিছু অংশে পুরুষ দৃষ্টির চিহ্ন প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই সিনেমায় নারী তার অধিকার সম্পর্কে জানতে এবং বাস্তবায়নে দৃঢ়তা দেখিয়ে তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছেন। নারী নির্মাতা বলেই নারীর অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট করতে এবং আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণে পাঞ্জেরীর ভূমিকা রাখতে বেশ অগ্রসর। নারীর তথাকথিত রূপায়ণ চিত্রের কিছুটা পরিবর্তন আভারকন্ট্রাকশন সিনেমায় উপস্থাপিত হয়। নারীর এ ধরনের চিত্রায়ণের সামাজিক প্রভাব প্রবল।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার চয়নিকা চৌধুরী তাঁর বিশ্বসুন্দরী চলচ্চিত্রে দর্শককে “ভাবুক” এ রূপান্তর করার একটা প্রয়াস লক্ষণীয় অর্থাৎ নারীর ভিতরের সৌন্দর্যই যে মূল তার উপস্থাপন করেছেন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, নারীর সক্ষমতা, নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্বতা ও নারীকে মানবিক বলে উপস্থাপনের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে চয়নিকা চৌধুরীর সিনেমায়। পরিচালক তাঁর সিনেমায় বলতে চেয়েছেন নারীর উপর আস্থা রাখা যায়, নারীকে শ্রদ্ধা করা যায়, নারীর আসল সৌন্দর্য রূপে নয় গুণে, নারী চেষ্টা করলে “পারে” প্রভৃতি। নারীর এরূপ নির্মাণের সামাজিক গুরুত্ব অনেক। কারণ তথাকথিত সমাজ ভাবে যে নারীর ভিতরের সৌন্দর্যের কোন দরকার নাই, আবার সুন্দর নারীর ভিতরে সুন্দর মন অনুপস্থিত যা আসলে সবক্ষেত্রে ভুলও হতে পারে। নারীকে দেখলে যেন চিন্তা বা ভাবতে প্রেরণা যোগায় এমন আধেয় বিশ্বসুন্দরী সিনেমায় উপস্থাপিত হয়েছে যা নারী দৃষ্টি এর উপাদান বটে। তবে চয়নিকা পুরুষ দৃষ্টিকে সব ক্ষেত্রে

উপেক্ষা করতে পারেনি কারণ নায়িকা কে (শোভা) কিছু দৃশ্য এমনভাবে দেখানো হয় যেন তা পুরুষ দর্শকের চোখে নির্মাণ। আবার ঘরের বউ স্বামীর কথার বাহিরে যেয়ে কিছু করতে পারবে না এমন চিত্রও কিছু দেখা যায় যা পুরুষতান্ত্রিকতার উদাহরণ।

মেহের আফরোজ শাওন নির্মিত কৃষ্ণপঙ্ক চলচ্চিত্রে পুরুষশাসিত পরিবারের আধিপত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই নারী নির্মাতা পুরুষশাসিত সমাজের চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন বটে কিন্তু সেই অর্থে নারীকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে পথ দেখাতে পারেননি; তবে নারী যে আর পুরুষের অধীনে থাকতে চায় না এই বিষয়টি কিছু দৃশ্যে ফুটে ওঠে। এই সিনেমায় পরিচালক নারী নির্মাতা হিসেবে “নারী দৃষ্টি”র তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ এই সিনেমায় নারীকে গৃহিণী, স্বামী ভক্ত, নারী ভোগ্যবস্তু, নারী অবলা প্রভৃতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে নারী পরিচালক হিসেবে তিনিও যে সমাজে নারীর অবস্থাকে অনুভব করে এবং তার পরিবর্তন চান সেরকম আধেয় লক্ষণীয়।

নারীকে মানবিক, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী, অধিকার সচেতন, ভোগ্যবস্তু, অবলা, টাকায় নারীর শরীর ইত্যাদি বিশেষণে নির্মাণ করেছেন আয়না সিনেমার পরিচালক কবরী। তার নির্মাণে নারী দৃষ্টির অনেক উপাদান উপস্থিত তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন নারীকে টাকার বিনিময়ে ভোগ করা যায়, সাহায্যের নামে পুরুষ তার কাম চরিতার্থ করতে পারে-পুরুষ দৃষ্টি ও পুরুষতান্ত্রিকতার মনোভাবের উপস্থিতিও দেখা যায়।

অন্যদিকে মেঘলা আকাশ সিনেমায় নারীকে মানবিক মানুষ, অধিকার সচেতন, পুরুষের দ্রষ্টব্য ও ভোগ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই নির্মাতাও পুরুষ দৃষ্টি বা পুরুষ নির্মিত কাঠামো থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হতে পারেনি। তবে নারীর অধিকার সচেতনতার বিষয়টি বেশ পরিলক্ষিত হয়। চলচ্চিত্র প্রেমী ও সমাজ সচেতন দর্শক যদি এসব চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তবে কাজে লাগানোর প্রয়াস দেখান তবেই নির্মাতারা নারীর অবস্থা পরিবর্তনের পাথেয় হিসেবে সিনেমা নির্মাণে আগ্রহী হবেন বলে বিশ্বাস।

৬. উপসংহার

বাস্তব সমাজের মতো চলচ্চিত্রেও “নারী” একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজ বিনির্মাণে নারী-পুরুষ উভয় যেমন অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে ঠিক তেমনি সমাজের প্রতিচ্ছবি চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের কোন বিশেষ দিক তুলে ধরতে চাইলে সেখানেও নারীকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ বাস্তব সমাজে নারী চিত্রের প্রতিফলনাকারে কতটুকু হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণের বিভিন্ন কৌশল নারীকে পুরুষের ইচ্ছার ক্রীড়ানক তথা পুরুষ চোখের

দৃষ্টি রূপে উপস্থাপন করতে প্রেরণা যোগায়। নারীর চোখে নারী নির্মাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নারীও নারীদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সম্পূর্ণরূপে ঘটাতে পারেনি। পাঁচটি সিনেমা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তিনটি সিনেমায় নারীকে নারী দৃষ্টি বা দৃষ্টিতে নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হলেও বাকিগুলো বিদ্যমান কাঠামোকে ভাঙতে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। তবে অপকেন্দ্র থেকে চলচ্চিত্রে নারীর নির্মাণ শুরু হয়েছে। চলচ্চিত্রে পুরুষ নির্মাতার তুলনায় নারী নির্মাতার সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কিন্তু যারা আছেন তারাও নারীর নির্মাণে নিজেদের মেলে ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন। তার অনেক কারণ থাকলেও একটি হলো শিল্পরূপকে ছাপিয়ে বাণিজ্য ভাবনা মূল হওয়া এবং নারীর মানসিকতায় পুরুষতান্ত্রিক ছাপ পুরোপুরি মুছতে না পারা। তারপরেও আমাদের নারী নির্মাতারা নারীদেরকে তাদের মতো করেই নির্মাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে নারী-নির্মাণ করতে হলে নারী নির্মাতাদের দল ভারী করতে হবে। সম্মিলিত প্রয়াসে কাজ করতে পারলে নারী নির্মাণের চিত্র বিশদভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অপ্রতুল নারী নির্মাতা ও ছোট আকারের নমুনায়ন। বৃহৎ আকারের তথ্য নিয়ে চলচ্চিত্রের আধেয়ের পাশাপাশি নারী নির্মাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক বিশ্লেষণ করতে পারলে “নারী দৃষ্টি” ধারণাটি আরও পরিস্ফুট হবে।

তথ্যপঞ্জি

- অনন্যা, মাহফুজা (২০১৯, ডিসেম্বর ৮)। নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে কবে?
বিডিনিউজ২৪.কম / <https://bangla.bdnews24.com/opinion/comment/58918>
- আবির, জেনিনা ইসলাম (২০১৬)। সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা: একটি
পর্যালোচনা। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, যাদ্যাসিক জার্নাল, সংখ্যা ২৩।
<https://www.bnps.org/journal/23/Jenina%20Abir.pdf>
- আউয়াল, সাজেদুল (২০১১)। চলচ্চিত্র কলার রূপ-রূপান্তর। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।
- আয়ালা, ডাইলা (২০২৩, মার্চ ২৩)। দ্য ফিমেল গেইজ: সিমপ্লি, হোয়াট ইট ইস ইট?
সোসিওমিক্স। <https://www.sociomix.com/diaries/lifestyle/the-female-gaze-simply-what-is-it/1607449923>
- আক্তার, নাসরিন (২০০১)। মেঘলা আকাশ (চলচ্চিত্র)। মিসেস নাসরিন আক্তার।
- কবরী, সারা বেগম (২০০৬)। আয়না (চলচ্চিত্র)। অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।
- কুণ্ডু, প্রিয়াঙ্কা (২০১৭)। সমসাময়িক বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা
অনুসন্ধান। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, সংখ্যা ১২, ঢাকা।
- গায়েন, কাবেরী (২০১৩)। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ,
ঢাকা।
- চৌধুরী, চয়নিকা (২০২০)। বিশ্বসুন্দরী (চলচ্চিত্র)। অঞ্জন চৌধুরী।
- জেনেট, গ্যারেট (১৯৮৩)। ন্যারেটিভ ডিসকোর্স। কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক।
<https://15orient.com/files/genette-on-narrative-discourse.pdf>
- জুনাইদ, নাদির (২০১৬)। চলচ্চিত্র গবেষণা: প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশ ফিল্ম
আর্কাইভ জার্নাল, সংখ্যা ১১, ঢাকা।
- তালুকদার, মো. উজ্জ্বল (২০২১)। জেন্ডার রেপ্রিজেন্টেশন অব মেইনস্ট্রিম মুভিস ইন
বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান একাডেমিক রিসার্চ ৯ (৫)।
<https://euacademic.org/PastIssueList.aspx?artid=103>
- নাসরীন, গীতি আরা, ও হক, ফাহিমদুল (২০০৮)। বাংলাদেশ চলচ্চিত্রশিল্প: সংকটে
জনসংস্কৃতি। শ্রাবণ প্রকাশনী ঢাকা।
- পারভিন, মমতাজ (২০০৫)। বাংলা চলচ্চিত্রে পেশাজীবী নারী। যোগাযোগ (যোগাযোগ ও
সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), সপ্তম সংখ্যা, ঢাকা।
- প্রথম আলো প্রতিবেদন (২০২০, এপ্রিল ৩০)। চলচ্চিত্রে নারী প্রতিকৃতি। প্রথম আলো।
<https://urlis.net/tt3wyk02>
- ভৌমিক, বিকাশ (২০০৯)। উইমেন অন স্ক্রিন: রেপ্রিজেন্টিং ওইমেন বাই ওইমেন ইন
বাংলাদেশ সিনেমা। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।
- রহমান, খান ফেরদৌস (২০১৫)। চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণায় তত্ত্বের ভূমিকা: প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, সংখ্যা ৮, ঢাকা।
- রহমান, খান ফেরদৌস (২০১৪)। ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ। নারী ও প্রগতি, সংখ্যা ২০।
<https://bnps.org/journal/20/Women%20and%20film.pdf>

- রাসেল, ক্যালাম (২০২৩, মার্চ ৮)। এন অ্যাসেনশিয়াল হিস্টরি অব ফিমেইল ফিল্মমেকার্স। ফররাউট।
<https://faroutmagazine.co.uk/essential-history-of-female-filmmakers-tues/>
- রোর মিডিয়া প্রতিবেদন (২০১৭, আগস্ট ১৮) অদম্য নারী নির্মাতাদের গল্প। রোর মিডিয়া।
<https://roar.media/bangla/main/book-movie/talented-female-film-directors>
- লভ্যাট, হ্যালেন (২০১৩)। দ্য এপিক গেজ: ভিশন, জেভার এন্ড ন্যারেটিভ ইন এনসিয়েন্ট ইপিক। ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইউএসএ। <https://doi.org/10.1017/CBO9781139060080>
- শাওন, মেহের আফরোজ (২০১৬)। কৃষ্ণপক্ষ (চলচ্চিত্র)। ফুরিদুর রেজা সাগর।
- হক, ফাহিমদুল (২০১৫)। স্টুয়ার্ট হল: রেপ্ৰিজেন্টেশন। সংহতি প্রকাশনী, ঢাকা।
- হক, ফাহিমদুল (২০২২)। চলচ্চিত্রঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
- হক, নাশরাহ (২০২১, এপ্রিল ২২)। লুকিং ফর দ্য ফিমেল গেইজ। ডেইলি স্টার।
<https://www.thedailystar.net/shout/news/looking-the-female-gaze-2081449>
- হায়াৎ, অনুপম (২০১৮)। চলচ্চিত্র বিদ্যা। পলল প্রকাশনী, ঢাকা।
- হোসাইন, সারা মামনি, ও নিবিড়, আল-মুহতাসিম, মো. মাহদি এবং রশিদ, মামুনুর (২০২৩)। আন্ডারকস্ট্রাকশন: দ্য ফিমেইল গেইজ ইন উইমেন ডাইরেক্টর'স ফিল্ম। এশিয়ান জার্নাল অব ইডোকেশন এন্ড সোসাল সাইন্স, ৩৮ (২)। <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v38i2821>
- হোসাইন, মানসুরা (২০১৬, আগস্ট ২)। চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন বদলায়নি। প্রথম আলো।
<https://t.ly/KhcKc>
- হোসাইন, রুবাইয়াত (২০১৯)। মেড ইন বাংলাদেশ (চলচ্চিত্র)। ল্য ফিল্মস দেলাপে-মিদি এবং খনা টকিজ।